"শুভ"

খন্দকার মোঃ আবদুল গণি

সবে মাত্র প্রাইমারীর গন্ডি পার হয়ে হাইস্কুলে প্রবেশ করেছি আর তাতে নিজেকে প্রচন্ড জ্ঞানী ভেবে কর্পুরের ন্যায় যেন বাতাসে ভাস্‌ছি। আমি একা নই আর ও কয়েকজনেরও একই অবস্থা। কিন্তু কতটুকু জ্ঞান অর্জন করেছি তা নিজের মনকে প্রশ্ন করলেই বুঝতে পারি তাই সদাই ওপরের ক্লাসে অধ্যায়নরত বড় ভাইদের দৃষ্টিকে ফাঁকি দিয়ে কোনরকমে দিনাতিপাত করি আর বয়ঃকনিষ্টদের কাছে বিভিন্ন মিথ্যা বুলি আর চাপার জোরে পান্ডিত্য জাহির করতে আমরা সকলেই প্রায় একরকম অভ্যস্ত হয়ে পড়েছি। দৈবাৎ কখনও যদি কেউ প্রশ্ন করে বসে " রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর " বানান কি, তখন কান চুলকাতে চুলকাতে বলি 'বানানটা বড়ই শক্ত' এবং আজও জীবনের মধ্যাহ্ন গগনে এসে ও বাংলা বানান রীতি ঐ একইরকম আছে। কোথায় হ্রস্বকার আর কোথায় দীর্ঘকার বসবে তার সঠিক রীতি আজও জানতে পারলাম না।

যাদের বাড়ী পাড়াগাঁয়ে অথবা যারা জীবনের একটা কাল হলেও পাড়াগাঁয়ে কাটিয়েছেন তারা আমার এ কথার সত্যতা স্বীকার করবেন এবং স্বীকার করে লজ্জায় মাথা নীচু করবেন অথবা পূর্বের ন্যায় আবার ও পান্ডিত্য জাহির করবেন। আমি অনেক সময় বসে বসে ভাবি আর আশ্চর্য হই এ জন্য যে বয়স তরতর করে বেড়ে যাচ্ছে দেকে যে সমস্ত বালক-বালিকা দের প্রমোশন দিতে মাষ্টার সাহেবরা বাধ্য হন সেই সমস্ত বালক-বালিকারাই গ্রাম্য গন্ডি পার হয়ে অন্যত্র এসে পন্ডিত বনে যান! এবং এই পান্ডিত্য দিয়েই আয়-রোজগার করে শহরে নিজেদের আবাস গড়ে নিচ্ছেন আর নিজেদের সু-খ্যাতির একটু কণা হলেও গ্রামের বাতাসের মধ্যে ছড়িয়ে দিয়ে গ্রাম্য বিচার-আচার হতে শুরু করে সমস্ত কাজ তাদের হস্তি সদৃশ্য পা ফেলে গ্রাম্য কীট আকৃতি মানুষ গুলোকে মেরে ফেলেন। আমার এ কথা শুনে হয়তো অনেকে বলবেন নিজে যা পারনি তা অপরে পেরেছে বলে হিংসায় তোমার পিত্তি জ্বলে যাচ্ছে। একথা শত মানুষের মুখে সহস্রবার শুনেছি। অতএব থাক্ আর বলে কাজ নেই। যা বলছিলাম তাই বলি।

যা বলছিলাম, প্রাইমারি পাশ করার পর বিদ্যালয় পরিবর্তন হল। আমাদের পার্শ্ববর্তী প্রায় দু'মাইল দূরে নগর গ্রামের একটি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে ভর্তি হলাম। পূর্বেই বলেছি যে ওপরের ক্লাসের কারও সাথে স্বাভাবতঃ মিশতাম না। নিরবেই পথ হাঁটতাম। আমাদের গ্রামের উত্তর মাথায় খন্দকার বাড়ীতে একটি ছেলে থাকত যার নাম ছিল ' শুভ '। আমাদের চেয়ে বয়সে বেশ বড় ছিল, দশম শ্রেনীতে পড়ত। ওর প্রতি কেন জানি আমি খানিকটা দুর্বল থাকলেও কোনদিন কোন কথা বলিনি দৈবাৎ ওর সাথে কখনও যদি স্বাক্ষাত ঘটত তবে চোখের চাউনিরই আদান-প্রদান হত, মুখের ভাষা নয়। জীবনের যাত্রারম্ভে দুখের সাথে শুভর স্বাক্ষাত ঘটেছে। ভেবেছিল তাকে পশ্চাতে ফেলে সম্মুখ পানে এগিয়ে যাবে কিন্তু তা আর হলোনা। ম্যালেরিয়া না কি জানি কোন এক ব্যামোতে মা মারা যাবার পর বাবা অন্যত্র বিয়ে করে কোথায় যে আছেন তার সঠিক খবর কেউ জানে না। মা-বাবাহীন এই এতিম বালককে রুগ্ন মামা নিজের কাছে এনে স্কুলে ভর্তি করিয়ে দিলেন কিন্তু বিধি বাম তিনিও ওকে একা ফেলে একদিন

পরপারে যাত্রা করলেন। অবশ্য মৃত্যুর পূর্বে সমস্ত জায়গা-সম্পত্তি ভোগদখল করার একটা বিধি-ব্যবস্থা করে দিয়েছিলেন বলেই রক্ষা নচেৎ কি যে হত!

শুভ নিজে কখনও চাষ করত না। অপরকে জমি-জমা বর্গা দিয়ে যা কিছু পেত তাতেই সারা বৎসরের খাওয়া পরা চলত এবং বেশ ভালোভাবেই চলত। সে নিজে রেঁধে খেত। মাথার ওপরে শাসন করার কেই ছিল না বলে পড়ালেখার উন্নতি কিরূপ হয়েছিল তা বলতে চাই না শুধু এটুকু বলব যে প্রায় দু'বছর ধরে সে একই ক্লাসে অধ্যায়নরত আর হেডমাষ্টার সাহেব বলেছেন যে এবারে পাশ করতে না পারলে স্কুল থেকে বাহিষ্কার করা হবে। এতে ওর কোন ভ্রুক্ষেপই ছিল না তাই সেবার ও ফেল করে স্কুল ছেড়ে দিল আর আমরা কচি লাউয়ের ডগার মত তরতর করে ওপরের দিকে উঠতে লাগলাম।

সেই যে শুভ স্কুল ছেড়ে দিল আর কোনদিন স্কুল অভিমুখে যেতে দেখিনি। অনেক দিন পর স্বাক্ষাত ঘটল এবং কথা বললাম একটা দুর্ঘটনার মাধ্যমে নগর স্কুল মাঠে বয়েজ ক্লাব আয়োজিত কৃষ্ণ পুর আর নগর গ্রামের মধ্যে শিরোপা নির্ধারেণের লড়াই এর দিন নিতাই নগর গ্রামের ছেলে হওয়া সত্বেও কৃষ্ণপুর গ্রামের ফুটবল দল আমাকে ভাড়া করেছিল। সে এক হাড্ডা-হাড্ডি লড়াই, দু' পক্ষই সমানে সমান। হঠাৎ খেলা শেষ হবার দু' তিন মিনিট পূর্বে অনিচ্ছা সত্বেও বলটি আমাকে ভালবেসে পায়ে একটু স্পর্শ দিয়ে ঢুকে গেল গোলপোষ্টে। আর গেল তো গেল সেই সাথে বাধিয়ে দিল চরম গন্ডগোল। নগর গ্রামের সমবেত দর্শক এ পরাজয় মেনে নিতে পারল না । তারা যে যার হাতের কাছে যা পেয়েছে তাই নিয়ে মাঠের মধ্যে নেমে পড়ল। শুরু হল জয় দখলের পালা। ইতিমধ্যে চার-পাঁচজনের একটি দল আমাকে ঘিরে ফেলেছে উদ্দেশ্য যে পা এই বিপত্তি ঘটিয়েছে তা টেঙিয়ে ভেঙে দেওয়া। ভাবলাম এবার বুঝি সবই যায়, ইহজগতে আর পা সোজা করে দাঁড়াতে পারব বলে মনে হয় না। নিজেকে প্রচন্ড দোষারোপ করতে লাগলাম আর পুরষ্কার নেবার জন্য প্রস্তুত হলাম। আকষ্মাৎ কোথা হতে শুভ ছুটে এসে ভিড় ঠেলে আমাকে টেনে বের করে নিয়ে গিয়ে বলল – পালা .....।

ইতিমধ্যে দু'চার ঘা অবশ্য পড়েছে। তথাপি দুর্বল না হয়ে দিলাম কষে এক দৌড়। আর কোন বিপত্তি ঘটল না। রাস্তার মাথায় এসে শুভকে উদ্দেশ্য করে বললাম– কাপড় পড়ে রইল যে....। আমার কথা শুনে ঘাড়টাকে বাঁকা করে এমনভাবে চাইল যে মনে হল সেই বুঝি অসমাপ্ত কাজ সমাপ্ত করবে। ক্ষণকাল পর কিছুটা স্বাভাবিক হলে প্রত্যুত্তরে অত্যান্ত শান্ত নিরব স্বরে আমাকে উদ্দেশ্য করে বলে উঠল – সামান্য কাপড়ের জন্য নিজের জীবনটা দিয়ে দিবি? বেঁচে থাকলে অমন ঢের কাপড় কিনতে পারবি।

কথাটি শতভাগ ঠিক্ ভেবে আর কোন বিলম্ব না করে হাঁটতে লাগলাম। ক্ষণকাল বয়ে যাবার পর যখন আর কোন বিপদের আশংকা নেই তখন সে পকেট থেকে তামাক পাতার বিড়ি বের করে দেয়াশলাইয়ের কাঠি দিয়ে জ্বালিয়ে ঠোঁটের মধ্যে পুরে সজোঁরে টানতে লাগল। তার এই অভাবনীয় কান্ড দেখে একবার সম্মুখে আর একবার পশ্চাতে চাইতে লাগলাম আর হাঁটতে

লাগলাম। আমার এহেন কীর্তি দেখে হয়তো বা সে বুঝতে পারল তাই আমাকে প্রশ্ন করে বসল–

কিরে অমন করছিস্ যে.....। যদি কেউ দেখে ফেলে? তখন সে যে সকল যুক্তি উপস্থাপন করল তাতে আমি হতভম্ব হয়ে গেলাম। ধুমপানের পক্ষে ক্ষণকাল সাফাই গেয়ে শেষে বলল– গ্রামের সবাই খায় আমি খেলে দোষ কি? তাইতো পল্লীগ্রামে সবাই যখন ও বস্তুটাছাড়া দিনাতিপাত করতে পারে না তখন শুভ খেলে দোষ কি! তাছাড়া সে তো আর জন সম্মুখে খাচ্ছেনা একটু আড়ালেই তার কর্ম সম্পাদন করছে। তাই কোন দোষ দেখতে পেলাম না। তথাপি মনটা যেন ক্যামন করতে লাগল। যা হোক আর কোন বাক্যালাপ আমাদের মধ্যে ঘটল না। রাস্তার মাথায় যখন দু'জনে একত্রে এসে উপস্থিত হলাম তখন সন্ধ্যা প্রায় হয় হয় আর এখানেই আমাদের দু'জনার পথ আলাদা হয়ে গেছে তাই সে আমাকে উদ্দেশ্য করে বলল– এখন যা...। শুভ চলে গেল । আমি এক দৃষ্টিতে ওর গন্তেব্যের পানে চেয়ে রইলাম। যখনও গাঢ় অন্ধকারের মধ্যে হারিয়ে গেল তখন আমি আর কোন বিলম্ব না করে নিজের ঘরের দিকে যাত্রা করলাম।

এর পরে বেশ কিছুদিন গত হয়েছে শুভর সাথে আমার স্বাক্ষাত ঘটেনি। আমার এ কথা শুনে অনেকে হয়তো বলবেন এ কাজ তোমার অন্যায় হয়েছে। যে ব্যাক্তি এতটা কষ্ট করে তোমাকে রক্ষা করেছিল তার খবর নেওয়া তোমার উচিৎ ছিল। তুমি প্রচন্ড স্বার্থপরের পরিচয় দিয়েছ। কিন্তু কেন যে যেতে চাইনি তার বিবরণ পাঠককে দেওয়ার আবশ্যকতা থাকলে ও তা স্বল্প পরিসরে দেওয়া সম্ভব নয়। শুধু এটুকু বলব যে পল্লী গ্রামে একে অপরের বিপদে সর্বাত্মকভাবে এবং স্বতঃস্ফুর্তভাবে পল্লীবাসীরা অংশগ্রহন করে থাকে এমন একটা জনশ্রুতি যে আছে তা একেবারেই ঠিক নয়, বরঞ্চ স্বার্থের প্রয়োজনে যার শক্তি বেশি তার দিকেই সকলে ধাবিত হয়। কেন জানি কি কারণে আমার পিতামহের ওর ওপর প্রচন্ড আক্রোশ ছিল আর আমার পিতা যিনি আমার পিতামহের একান্ত ভক্ত তাঁর ও ঐ একই অবস্থা। বংশগত দিক থেকে আমরা ছিলাম সৈয়দ বাড়ীর আর শুভ খন্দকার বাড়ীর। সৈয়দ এবং খন্দকারের দ্বন্ধ সত্যযুগের পল্লীগ্রামে হরহামেশাই ঘটত। এখন দিন বদলে গেছে তবে ইতিহাস স্বাক্ষী হয়ে আছে। বংশগত কারনেই হোক আর স্বার্থগত কারনেই হোক আক্রোশ আছে এবং তা প্রচন্ড তা অন্ত তঃ বুঝতাম। তাই পিতা-পিতামহ যাকে শত্রু ভেবে থাকে অমি তাদের উত্তরাধীকার হয়ে কি করে মিত্রতা স্থাপন করব? কিন্তু কেন জানি সে দিনের পর থেকে ওর উপর সদাই আমার মনটা পড়ে থাকত কিন্তু শাসনের বেড়াজাল ছিন্ন করে ওর সাথে স্বাক্ষাত করার কোন সুযোগই দিনের বেলায় আমার এ ঘটে ঘটত না তাই একদিন সিদ্ধান্ত নিলাম রাত্রিকালে সুযোগ বুঝে দেখা করব।

যেমনি ভাবা-তেমনি কাজ। সমস্ত ভয় ডর দুর করে একদিন রাত্রিকালে ঘর ছেড়ে বের হলাম। ধরা পড়ার সম্ভাবনা অবশ্য ক্ষীণ কারণ আমার পিতামহ রাত্রি ৮/৯ টাকে গভীর রাত্রি ভেবে শান্তির নিদ্রায় মগ্ন থাকতেন আর মাতা! ছোট বোনটাকে নিয়ে ঐ একই অবস্থায় পড়ে থাকতেন। পিতা শহরে চাকরি করেন সেই সুবাদে তিনি সেখানেই থাকতেন। আমি থাকতাম

আমার পড়ার ঘরে যেখান থেকে বের হয়ে গেলে তিনটি প্রাণীর কেউ ঘুনাক্ষরে ও বুঝতে পারবেনা। ইতিপূর্বে অবশ্য কাজটা করতে পারতাম কিন্তু মনের ভয়ে তা করিনি। এর কারণ এই যে শুভর সাথে স্বাক্ষাত করতে গেলে গোরস্থানের পাশ দিয়ে হেঁটে যেতে হবে। গোরস্থানকে ভয় পায় না এমন মনুষ্য জীব আমাদের পাড়ায় কেউ ছিল না আর আমি তো আমি যে কিনা বাতাস প্রবাহের শব্দকে দৈত্যের নাসিকা হতে শ্বাস-আদান-প্রদান কে বুঝে থাকি। কিন্তু সেদিন কেউ যেন আমার বুকে একবোঝা সাহস দিয়েছিলেন বলেই গোরস্থানকে এক প্রকার তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য করেই শুভর বাড়ীর সম্মুখে এসে উপস্থিত হলাম।

প্রকান্ড দো-তালা মাটির ঘর। এমন ঘর এ গ্রামে শুধু দু'টি আছে। একটি সৈয়দ বাড়ী আর একটি খন্দকার বাড়ী। হয়তো উভয় বংশধরের কর্তা দু'টি পাল্লা দিয়ে গড়েছিলেন। শুভ কোন ঘরে থাকত তা জানতামনা তাই বাড়ীর মধ্যে প্রবেশ করে ডাক দিতেই দরজা খুলে বের হয়ে এসে জিজ্ঞাসা করল– কে.....? আমি জবাব দেবার পূর্বেই আমাকে চিনতে পেরে নিজের প্রশ্নের উত্তর নিজেই দিয়ে বলে উঠল– ও সাজু ! তা কি মনে করে এই রাত্রিকালে এলি? আমি অত্যান্ত শান্ত স্বরে একেবারে একান্ত অনুগতের মত বলে উঠলাম – তোমাকে দেখতে এসেছি। – বেশ ভালই হয়েছে। নগর পূর্ব পাড়া আজ পালাগানের আসর বসবে। তুই যাবি আমার সাথে? ইতিপূর্বে পালাগানের আসর কোনদিন দেখিনি বা শুনিনি। অনেক বার চেষ্টা করেছি কিন্তু ললাটে সৌভাগ্যের চিহ্ন পড়েনি। আজ যখন সমুহ সম্ভাবনা দেখা দিল তখন তা হেলায় হারাব এমন বোকা আমি নই। কোন প্রকার দ্বিরুক্ত না করে প্রতি উত্তরে বললাম – যাব। দু' জনে একত্রে বের হলাম। ইতিমধ্যে সমস্ত অন্ধকার দূর করে আকাশে তৃতীয়া তিথীর চাঁদ উঠেছে। পূর্ণিমা চাঁদের বিকশিত আলোয় সমস্ত বিশ্ব প্রকৃতি এক অপূর্ব সাজে সেজে উঠেছে। মৃদুমন্দ বাতাসের শীতল আমেজে আমার মনে এক অপূর্ব আনন্দ হিল্লোল খেলা করতে লাগল। ভাবলাম এইত জীবনের আসল স্বাদ, পরিপূর্ণ আনন্দ। এই পথ যেন শেষ না হয়। বয়ে চলে যাব এই পথ বেয়ে দেশ হতে দেশান্তরে। তাছাড়া শুভর মত দুরন্ত সাথী পাশে থাকলে ভয় কি? এমনি এক অনুভূতি নিয়ে দু'জন একত্রে হাঁটছি। মুখে কোন কথা নেই যেন আমারই মত শুভ এক স্বপ্নীল অনুভূতি নিয়ে এগুচ্ছে। ক্ষণকাল এমনি কেটে যাবার পর হঠাৎ শুভ বলে উঠল – আজ কে গান গাইবে জানিস্? আমি তার কিছুই জানতাম না। তবে শুনেছি এ অঞ্চলে পালাগানের ওস্তাদ নগর গ্রমের সম্ভুনাথ আর তার সপ্তদর্শী কন্যা হীরা। এরা দু'জনেই পুরনো ঐতিহ্যকে ধরে রেখেছে। তাই একপ্রকার আন্দাজ করে বলে ফেললাম – শম্ভুনাথ আর হীরা হবে হয়তো। – তুই ঠিকই বলেছিস্। কিন্তু হীরা আর গান গায় না। কে গান গায়, আর কে গায় না তা আমার জানার কথা নয় আর তাতে কিছু আসেও যায় না। তাই কোন প্রকার বাক্যালাপ না করে তার মুখের দিকে চাইলাম। চেয়ে দেখলাম ঐ মুখে কিসের যেন এক ব্যাথা, কিসের যেন শুন্যতা, কি যেন বলতে চায় কিন্তু বলতে পারে না। ইতিপূর্বে শুভর মুখাকৃতি কখনো দেখিনি। কোনপ্রকার বিরক্ত প্রকাশ করব না ভেবে চুপ করে রইলাম। এমনি করে আমরা যখন সম্ভুনাথের দুয়ারে এসে উপস্থিত হলাম তখন রাত্রি বেশ হয়ে গেছে। কিন্তু কোথায় পালাগান? কোন মানুষ জনকে দেখছিনা। তবে কি শুভ মিথ্যে বলেছে? তাই বা কি করে

সম্ভব? শুভ মিথ্যে কথা বলবে এ বিশ্বাস আমার কোনকালেই ছিল না। তাই কোন প্রশ্ন না করে চুপ করে রইলাম। আমাদের দু'জনকে একত্রে দেখে সম্ভুনাথ সমাদর করে বসাল। দেখলাম শুভ এদের পূর্ব পরিচিত। আমাকে বসিয়ে রেখে শুভ অন্দরমহলে প্রবেশ করল। আমি আর সম্ভুনাথ ঠাঁয় বসে রইলাম। সম্ভুনাথকে একা পেয়ে বলে উঠলাম– আজ নাকি পালাগানের আসর বসবে? আমার কথা শুনে মুহুর্তে তার চোখ বেয়ে ফোঁটা ফোঁটা অশ্রু ঝরতে লাগল। আমি হতভম্ব হয়ে গেলাম। বুঝতে পারলাম না গানের কথা শুনে এমনভাবে কাঁদছে কেন? নিজেই যেহেতু অপরাধ করেছি সেহেতু নিজেই নির্দোষ প্রমানিত হবার জন্য পুনরায় বলে উঠলাম – আপনি কাঁদছেন কেন? প্রতিউত্তর পাওয়া দুরের কথা দেখলাম তার আঁখি হতে পূর্বাপেক্ষা জোরে জোরে অশ্রুফোঁটা ঝরছে। কিছুটা নিজেকে সামলে নিয়ে বলে উঠল– সরকার বাড়ীর ছোট ছেলে বাধা দিয়েছে আর বলেছে এটা মুসলমানের গ্রাম। এ গ্রামে এসব চলবেনা। ঘরে অসুস্থ মেয়েকে নিয়ে এখন আমি কি করব তাই ভাবছি আর কাঁদছি। না পারব ওর মুখে দু' টো অন্ন দিতে না পথ্য। এখন আমি কি করব বাবা! বাবা কথাটি শুনে চম্‌কে উঠলাম। মুখের পানে চোখ তুলে চেয়ে স্পষ্ট দেখতে পেলাম আমারই পিতার মুখ ঐ মুখের মাঝে ঠাঁয় করে নিয়েছে। আমার বাবার প্রতিকৃতি যেন ভেসে ভেসে উঠছে। এমনি অবস্থায় আমারও চোখ জলে ভরে উঠল। নিজেকে সামাল দিয়ে বললাম– কি হয়েছে? আজ কয়দিন থেকে জ্বর। মেয়েটা এই কয়দিন কিছুই মুখে দেয়নি। পুনরায় ঐ মুখের পানে চাইলাম। দেখলাম সন্ত ানের জন্য মায়া যেন ঝরে পড়ছে। কি অপূর্ব মায়া ঐ চোখে মুখে! মায়া আছে, ভালোবাসা আছে, কর্তব্য আছে কিন্তু সামর্থ নেই। দারিদ্রতার নির্মম কষাঘাতে আজ তার জীবন পঙ্গু কিন্তু পিতার মন মরে যায়নি। দেশ বিভাগের পর আত্নীয় স্বজনরা ওপারে পাড়ি দিয়েছে কিন্তু জন্মভুমিকে ভালোবেসে সে এখানেই পড়ে আছে। শুনেছি এককালে সামর্থ ছিল এমন একটানায় পাঁচটা মেয়েকে ডাক্তার দেখাবার কিন্তু তাও আজ ভেঙে গেল। অশ্রুতে সামান্য হার্টফেলে মরে যে যায়নি তাই ঢের। ভাবটা কিছুটা স্বাভাবিক হলে আমি তাকে উদ্দেশ্য করে বলে উঠলাম– আমি কি একবার দেখতে যেতে পারি? হয়তো কথা বলার কোন সামর্থ ছিল না অথবা মনে সায় দেয়নি তাই প্রতিউত্তরে সম্মতিসূচক মাথা নাড়ল। সম্মতি পেয়ে আমি ঘরের মধ্যে প্রবেশ করে যা দেখলাম তাতে আমার মাথা ঘুরতে লাগল। ভাগ্যিস আমার সাথে পৃথিবীও ঘোরে নি তাই রক্ষা নচেৎ চিৎপটং হয়ে পৃথিবীর উপর পড়ে সাথে সাথে ঘুর্নন গতির মত ঘুরতে হতো, সে সব থাক্ যা হয়নি তা বলে লাভ নেই। যা ঘটেছে তাই বলি দেখলাম মেয়েটি শুভর কোলে মাথা রেখে শুয়ে আছে আর শুভ ঘনকালো মেঘসদৃশ্য চুলের মধ্যে হাতের পাঁচটি আঙুল চিরুনির মত চালাচ্ছে। মেয়েটি চোখ বুঁজে যেন স্বর্গলোকের কোন স্বর্গীয় বিছানায় মায়ানিদ্রা যাচ্ছে এ দৃশ্য দেখে ভেতরে প্রবেশ করার সাহস হল না। দরজায় ঠাঁয় দাঁড়িয়ে রইলাম আর দেখতে লাগলাম অপূর্ব সে দৃশ্য। আমার কল্পনার চোখে দেখতে পেলাম জীর্ণ বস্ত্র আসলে জীর্ণ নয় তা রেশমী সুতোয় বোনা মনি-মানিক্য খচিত রাজকুমারীর বস্ত্র আর ঐ শ্যামলা মেয়েটি সোনার পালংকে মায়ানিদ্রা যাচ্ছে। দেখে মনে হচ্ছে কোন অসুর যাদুকর যাদুর বশে ঘুমের দেশে নিয়ে গেছে আর শুভ রাজকুমার বেশে রাজকুমারীকে মায়ানিদ্রা হতে জাগাবার আশায় ঠাঁয় শিয়রে বসে আছে কোন দৈব মন্ত্রের আশায় যে মন্ত্রবলে ঘুম ভাঙবে

রাজকুমারীর আসবে তার আনন্দের মুক্তি। হয়তো সেই সোনার কাঠি,রূপোর কাঠি যার সূধাময় স্পর্শেই জেগে উঠবে রাজকুমারী। এভাবে বেশ কয়েকমিনিট অতিবাহিত হল। দু' জনার কেউ যখন মায়ার জগত হতে নিস্কৃতি পেল না তখন মুক্ত করার জন্য সমস্ত লাজ ভেঙে একেবারে ভেতরে প্রবেশ করলাম। আমার পায়ের শব্দে মেয়েটির ঘুম ভেঙে গেল আর সে রুগ্ন শরীর নিয়ে উঠে বসার চেষ্টা করল। আমি বাধা দিয়ে বললাম– থাক্ থাক্ আর উঠতে হবে না। তুমি শুয়েই থাক। কিন্তু মেয়েটি আমার কথা শুনল না। উঠে বসে পড়ল। শুভ পাশের অর্ধভাঙা টুলটির দিকে নির্দেশ করে বলল– ওটা টেনে নিয়ে বয়। –বসলে চলবে না। রাত অনেক হয়েছে। এখন না গেলে নয়।–তুই বাইরে গিয়ে একটু বয়। আমি আসছি। আমি বাইরে এসে পূর্বে যেখানে বসেছিলাম সেখানে বসে ভাবতে লাগলাম ওদের সম্পর্কের কথা। হয়তো নতুন নয় বহুদিন পূর্ব হতেই একে অপরের হৃদয় তিল তিল করে জয় করে আজ এ পর্যন্ত এসে পৌঁছেছে। এদের সম্পর্ক কি এ সমাজের বাসিন্দারা মেনে নেবে? মুসলমান ছেলের সাথে হিন্দু মেয়ের পরিনয় হয়তো অন্য কোথাও বাস্তব হয়েছে কিন্তু এ খানদানে কেউ স্ব-চক্ষে দেখেছে এমন নজির নেই এমনকি আমিও দেখিনি তবে আধুনিক যুগে অর্থাৎ বর্তমান কালে অনেক জায়গায় বাস্তবে পরিনত হয়েছে শুনেছি। শেষ পর্যন্ত না জানি কি হয়। অশুভ আশংকা মনে নিয়ে উর্ধ্ব মুখে চেয়েছিলাম। হঠাৎ শুভর পদধ্বনীতে চমক ভাঙিল। আমার সামনে এসে শুধু একটি কথাই বলল "চল" কোন প্রকার বিলম্ব না করে ত্বড়িৎগতিতে উঠে দাঁড়িয়ে ওকে অনুসরণ করলাম। গ্রাম ছেড়ে বড় রাস্তার ওপর যখন উঠলাম তখন পূর্ব আকাশের শুকতারা উঠে গেছে। বাক্যহীন দু' টি প্রাণী হেঁটেই চলেছি। কারও মুখে কোন কথা নেই। কতক্ষণ আর এভাবে থাকা যায়? নিরবতা ভেঙে আমিই কথা বলে উঠলাম– তুমি কি মেয়েটিকে ভালোবাস? আকস্মাৎ আমার কথা শুনে শুভ চমকে উঠল। কোন প্রকার ভীতির ভাব ও মুখে ফুটে উঠতে দেখলাম না। অত্যান্ত মৃদু শান্ত স্বরে সে বলল– আমি মেয়েটিকে ভালবাসি আর ও সুস্থ হলেই আমি ওকে বিয়ে করব।– বিয়ে করবে!–কেন্ রে আমি কি বিয়ে করতে পারি না? – না তা নয়, তবে জাত বলে একটা কথা আছে না? তা ছাড়া ধর্ম....? – তোদের এই এক দোষ। ধর্মকে অস্বীকার আমিও করি না। তবে এটুকু বুঝি মানুষের প্রয়োজনে ধর্ম – ধর্মের প্রয়োজনে মানুষ নয়। মানুষই যদি না থাকে তবে ধর্ম দিয়ে কি হবে রে হতভাগা? – তবুও.....। তবুও কি রে.....? – সবাই যদি মানে, তুমি মানবে না কেন? – আচ্ছা মানলাম। এখন তুই বল অসুস্থ একটা মেয়েকে নিয়ে এক হতভাগ্য বাবা দিনের পর দিন উৎকণ্ঠা আর শঙ্খায় দিনাতিপাত করছে, কেউ কি সাহায্যের হাত বাড়িয়েছে? বাড়ায়নি, বরঞ্চ চেয়ে আছে কখন মেয়েটা মরবে আর শ্বসানে নিয়ে গিয়ে প্রাণহীন দেহটাকে ভস্ম করে মুখে দু' টো পুরবে। এখানে ধর্ম বাধেনা? আসলে বিবেকই ধর্ম। হয়তো দু' জনার মধ্যে আরও কথার আদান-প্রদান হত কিন্তু বিদায় নেবার স্থানে দু' জনে এসে উপস্থিত হয়েছি তাই বিদায় নিয়ে যে যার ঘরে পৌঁছলাম এবং ঘুমিয়ে পড়লাম। ঘুম ভাঙল বেলা ৮/৯ টায়। শয্যা ত্যাগ করে নিমের মেছওয়াক হাতে ধরে দাঁতের মধ্যে চালাতে চালাতে বৈঠকখানার অভিমুখে হাঁটতে লাগলাম। বারান্দায় দৃষ্টি পড়ামাত্র দেখতে পেলাম যে আমার পিতামহ চেয়ারে আসীন আর তার পাশের ছোট্ট একটি টুলে শুভ বসে কি যেন আলাপ করছে। বেশ কৌতুহল বোধ করে উভয়ের সামনে

হাজির হলাম। প্রবেশ অবধি উভয়ের মাঝে নিরবতা লক্ষ্য করলাম। উভয়ে চিন্তার গভীর সাগরে হাবু-ডুবু খাচ্ছে যেন কোন কুল নেই, কিনারা নেই চারিদিকে শুধু অথৈ লবনাক্ত পানি খেলা করছে যা পান উপযোগী নয়। হঠাৎ শুভ কুল খুঁজে পেয়ে অত্যান্ত প্রফুল্ল বদনে আশান্বিত মন নিয়ে বলে উঠল– তাহলে দাদা, আপনি পশ্চিমের জমিটা বন্ধক নিয়ে আমাকে হাজার পাঁচেক টাকা ধার দেন। টাকাটা আমার ভীষণ প্রয়োজন। একথা শুনে আমার দাদুর চিন্তিত মুখে হাঁসির ঝলকানি দেখা দিল। সে হাঁসি কিরুপ ছিল যে দেখেনি সে বুঝতে পারবে না। সে হাসির সাথে কল্পনা করে কি উপমা যে দেব তা এ ক্ষুদ্র মানষিকতা খুজে পাচ্ছে না বলে উপমা নাইবা দিলাম তবে সচেতন পাঠককে এটুকু বললেই হয়তো বুঝতে পারবেন যে সুযোগ সন্ধানী মানুষেরা অপরকে ঘায়েল করার যে সমস্ত কৌশল অবলম্বন করে তার সমস্ত ব্যার্থ হবার পর নতুন সুযোগ হস্তগত হলে মুখ অবয়বে যেমন খুশির ঝলকানি এসে নীত হয় আমার দাদুর মুখেও ঠিক তেমনি হাঁসি দেখেছিলাম। খুশী ভরা নেত্রে শুভর দিকে চেয়ে আমার দাদু বললেন– তা ভাই, টাকা যে তোমাকে ধার দেব তারত একটা দলিল থাকা চাই, কি বল? তুমি জমির দলিলটা একবার নিয়ে এসো। – দলিল কোথায় আছে তা আমি ঠিক জানি না, খুঁজে দেখতে হবে। আমি ফিরে এসে আপনাকে সব দেব। আমার ওপর বিশ্বাস রাখতে পারেন। – আর ভাই বিশ্বাস! এখন নিজেরেই বিশ্বাসএনই, তোমাকে বিশ্বাস করি কি করে? – শেষকালে অনেক কাঠ্য-অকাঠ্য যুক্তি উপস্থাপনের পর শুভর ললাটে সৌভাগ্যের চিহ্ন পড়ল। রাত্রিকালে দলিল পৌঁছিয়ে দেবার শর্তে হাজার খানেক টাকা নিয়ে শুভ বৈঠক ঘরের বারান্দা হতে নেমে এল। আমি ও ওর পিছু পিছু বাইরে বের হয়ে এলাম। দাদুর দৃষ্টিসীমার বাইরে যাবার পর আমি পেছন হতে শুভকে ডাক দিয়ে জিজ্ঞাসা করলাম – মেয়েটিকে কি হাসপাতালে নিয়ে যাবে? প্রতিউত্তরে অনেক কিছু আশা করেছিলাম কিন্তু তা আর হল না। পিছন পানে একটিবার দৃষ্টি নিক্ষেপ করেই দৃষ্টি অন্যত্র ফিরিয়ে নিয়ে শুভ দ্রুতপদে হেঁটে চলে গেল। নিজে যদিও কোনদিন কোন মেয়ের সংস্পর্শে যাইনি বা সে বয়সটা যদিও তখনও হয়নি তথাপি সে বয়সেই কেমন করে যেন শুভর কষ্টটা বুঝলাম। নিজের অজান্তে আঁখি হতে দু' ফোটা অশ্রু ঝরে পড়ল। চোখ দু' টো মুছে ফিরে এসে উঠোনের এককোণে দন্ডায়মান জাম্বুরা গাছের সাথে ঠেস্ দিয়ে দাঁড়িয়ে ভাবতে লাগলাম এদের পরিণতির কথা। আমি বেশ ভালই আমার দাদুকে চিনতাম। স্বার্থের প্রয়োজনে তিনি যে কোন পথ অবলম্বন করতে পারেন। যেহেতু তিনি গ্রামের মাথা সেহেতু তিনি যা রায় দেবেন তাই কার্যকর হবে। তিনি গ্রামের মাথা হিসেবে এমন অধর্মওক সায় দেবেন এমনটা মনে হয় না। অতএব শুভর ধ্বংস এবার নিশ্চিত। ওকে বারণ করব এমন সাহস ও নেই। ও আমার চেয়ে বয়সে এমনকি বুদ্ধিতে অনেক বড়। তাছাড়া এখন সে পুষ্প পূজারী। পুষ্প পূজা সাজ্ঝ করতে কাঁটার আঘাত সইতে হয় একথা সত্য-শ্বাশ্বত। প্রকৃত পূজারী পূজা সাজ্ঝ না হলে ক্ষান্ত হয় না। সে অত্যান্ত সাবধানে কোন এক দৈব মন্ত্রবলে ওপরের দিকে উঠতে থাকে। যারা অর্ধপূজারী তারা অবশ্য ভাবে এ লোকটার অধঃপতন নিশ্চিত। অতি উচ্চস্থান হতে একেবারে পাতালে নিক্ষিপ্ত হলে ধ্বংস অনিবার্য একথা সেও বোঝে তথাপি কোন কিছুর তোয়াক্কা না করে একটু একটু করে উপরে উঠতে

থাকে আর যে উপরে উঠে যায় তাকে নীচে নামানো বেশ কষ্টকর। একেবারে ধ্বংস না হওয়া পর্যন্ত তাকে ফেরানো যায় না।

আমি শুভকে চিনতাম। শত বারণ সত্বে ও সে সেদিকেই যাবে। কোন কাজে পরাস্ত হবার পাত্র সে নয়। তাছাড়া সে দিন দেখেই বুঝছিলাম সে দেবীর স্বাক্ষাত পেয়েছে। দেবীর মনতুষ্টির জন্য পূজারী কতইনা প্রার্থনা করে থাকে। দেবীর সু-দৃষ্টি হলে হল, নচেৎ না। তবুও পূজারী দিনের পর দিন কল্পিত স্বপ্ন আর আশা বুকে নিয়ে দেবীর মনতুষ্টির জন্য পূজার থালা সাজিয়ে প্রার্থনা করে। যে দেবীকে নিজের আয়ত্বে আনতে পেরেছে সে কি ছেড়ে দেবে? কস্মিনকালেও না। মাটির প্রতিমাকে গঙ্গার জলে বিসর্জন দেওয়া প্রকৃত বির্সজন নয়, আনুষ্টানিকতা মাত্র। দু'টি নদীর মিলন মুখে বাধার যে বালুচর জেগে উঠে তা ভেঙে চুরে পুর্নবার মিলিত হবার আকাংখা যদি নদীর ব্রত হয় তবে মনুষ্য জীবন নদীর ক্ষেত্রে তার ব্যাতিক্রম ঘটবে কেন? বেশ খানিকটা সময় এমনি আকাশ–কুসুম ভাবনা শেষে উঠে দাঁড়িয়ে বাড়ির মধ্যে প্রবেশ করে স্কুলে যাবার প্রস্তুতিপর্ব সাঙ্গকরে স্কুল অভিমুখে যাত্রা করলাম। দু'তিন দিন শুভর আর কোন স্বাক্ষাত নেই। স্কুলে যাবার সময় প্রায় প্রত্যেকটা দিন ওর বাড়িটার দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করতাম। কিন্তু দৃষ্টি শূন্য ফিরে আসত। কাউকেও দেখতে পেতাম না বা কেউ যে এসেছে এমন নমুনাও এ পোড়া চোখে দৃষ্টিগোচর হত না। অবশ্য শুনেছি যে রাত্রে দলিল পৌঁছিয়ে দেবার কথা ছিল সে রাত্রেই পৌঁছে দিয়ে গেছে। ভাগ্যের দোষেই হোক আর যে কারণেই হোক শুভর ছায়ামূর্তিটুকু ও দেখার সৌভাগ্য আমার হয়নি। অবশ্য নিজের কোন বিশেষ লাভের জন্য নয়। মেয়েটির প্রতি কি যেন এক অজানা আকর্ষনে আমার মনে তার ছায়া পড়ে গেছে বলে খোঁজ-খবর নেবার জন্য মনটা সদাই আঁকু–পাঁকু করত। চতুর্থ দিনে স্কুল ছুটি হবার পর বের হয়েই দেখি শুভ গেটের বাইরে দাঁড়িয়ে। ওর মুখ অত্যান্ত প্রফুল্ল, পায়ে জুতো নেই-হাঁটু পর্যন্ত ধূলায় ভরা। এ দীন চেহারার মাঝে ও ভেসে আসছে জয়ের আনন্দ। বিজয়ের গর্ব সমস্ত মুখ অবয়বে এক অপূর্ব মায়াবী আভা দান করেছে। ইশারা করে মাঠের ও দিকটায় ডেকে নিয়ে গিয়ে শুভ বলল– হীরা তোকে ডেকেছে। – কোথায়?– হাসপাতালে। তুই কি একবার আমার সাথে যেতে পারবি? আমি সম্মতিসূচক মাথা নাড়লাম। আমার সম্মতি পেয়ে খুশীতে ওর চোখ-মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল। আবেগে আমাকে জড়িয়ে ধরে বলল- সত্যি ভাই তুই খুব ভাল। তখন তের পার হয়ে চৌদ্দ পড়েছে। অপরের মুখে নিজের প্রশংসা শুনে ক্ষুধার্ত পেট প্রশংসার বাণীতে পূর্ণ হয়ে উঠল। দুর্বল মানসিকতা তৎক্ষনাই ত্যাগ করে গা ঝাড়া দিয়ে বলে উঠলাম – জোরে চল্ , আমাকে সন্ধ্যানাগাদ ফিরতে হবে। দু'জনে ঘন্টাকাল হেঁটে যখন হাসপাতালের কাছাকাছি পৌঁছলাম তখন সূর্য পশ্চিম আকাশে বেশ খানিকটা ঢলে পড়েছে্ সারাদিন কর্মব্যাস্ত থাকার পর পাখিগুলো ডানায় ভর দিয়ে ঝাঁকে ঝাঁকে নীড়ে ফিরছে। দূর হতে রাখালের রাগিনীর রাগ থেমে থেমে বাজছে। দু' একজন অবশ্য গরুর পাল নিয়ে ইতিমধ্যে গৃহ অভিমুখে যাত্রা শুরু করছে। গবাদি পশুর পায়ের খুরের ধাক্কায় পথের ধুলো উর্ধ্বমুখে ধাবিত হয়ে সূর্যরশ্মির সাথে মিতালী করে দুরের গ্রামগুলির মাঝে অবস্থান করে এক অপূর্ব মায়াবী পরিবেশ সৃষ্টি করেছে।

মফস্বল শহরের হাসপাতাল। রোগির সংখ্যা হাতেগোনা। জটিল রোগে আক্রান্ত রোগির বেশীর ভাগই শহরের বড় হাসপাতালে গিয়ে উঠে। এখানে যে সমস্ত রোগী এসে আশ্রয় লাভ করে তাদের বেশীর ভাগই নিম্ন মধ্যবিত্ত অথবা দরিদ্র। গ্রাম্য হাতুড়ে ডাক্তারদের সব রকম চেষ্টা যখন ব্যার্থ হয়ে যায় তখনই এলাকাবাসীর প্রয়োজন পড়ে ঐ স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সটি। মূলতঃ স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সটি নার্স প্রধান। ডাক্তারগণ নির্দিষ্ট সময় পর এসে সময় পূর্ণ হবার বহুকাল পূর্বে শহরে ফিরে গিয়ে নিজস্ব ব্যাবসায় নেমে পড়ে। চারিদিকের নর্দমা হতে যে সুগন্ধ! বের হচ্ছে তা অতিক্রম করতে হলে নাসারন্ধ্রের মধ্যে আঙুল ঢুকিয়ে এক দৌড়ে পথ অতিক্রম করে দ্বি-তল ভবনবিশিষ্ট স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে প্রবেশ করতে হয়। ভেতরের পরিবেশ কিরূপ ছিল তার বর্ণনা দিয়ে বিয়ের ক্ষেত্রে সবচেয়ে উত্তম পাত্র শ্রদ্ধেয় ডাক্তার মশায়দের সুখ্যাতি! আর বাড়াব না শুধু এটুকু বলব যে এমন ভবন স্বাস্থ্য সেবার জন্য ব্যাবহার না করাই শ্রেয়ঃ। এই বঙ্গদেশ বোধকরি তার সন্তানদের এত সহজে ভূ-গর্ভের মাঝে নিতে চায়না বলেই আলো-বাতাস দান করে এমন পরিবেশের মাজেও বাঁচিয়ে রাখে। না হলে এখানে যে আস্ত সে আর বাচত বলে মনে হয় না।

দ্বি-তল ভবনে উঠে নির্দ্দিষ্ট কক্ষের সামনে এসে অতি সন্তর্পনে দরজা খুলে আমরা দু' টি প্রাণী ভেতরে প্রবেশ করলাম। সে ঘরে হীরা নামক মেয়েটি ছাড়া আর কেউ নেই। আমরা দু'টি প্রাণী যে প্রবেশ করেছি সে দিকে তার কোন দৃষ্টি নেই। দেখলাম একটা জানালার ধারে চুপ করে বসে পশ্চিম দিকে চেয়ে দূরে খেলারত কিশোরদের দিকে চেয়ে মিটিমিটি হাঁসছে। বোধকরি বাল্যকালের স্মৃতিময় মধুর ক্ষণগুলোর কথা মনে পড়েছে আর তাতে অবগাহন করে ভাবের অতল সাগরে প্রবেশ করেছে। হয়তো ভাবছে হায় কাল! তুমি বৃদ্ধ যাযাবরের মত বয়ে চলে এক একটি সময়ে জীবনের এক একটি অধ্যায়ের জন্ম দাও। এইত শিশুকাল ছেড়ে কৈশোর, কৈশোর ছেড়ে যৌবন, যৌবন ছেড়ে বার্ধক্য আর বার্ধক্য ছেড়ে অন্য এক অসীম জগতে পদার্পন করতে হবে। হয়তো আরও ভাবের অতল সাগরে প্রবেশ করত কিন্তু তা আর হল না। অত্যান্ত মৃদু শান্তস্বরে শুভ হীরাকে উদ্দেশ্য করে বলে উঠল। – হীরা, সাজু এসেছে। – আকস্মাৎ মনুষ্য ধ্বনী শ্রবণে তার চমক ভাঙল। চম্‌কে উঠে পশ্চাৎপানে চেয়ে আমাকে দেখে দুই হাত জড়ো করে বলে উঠলো– নমষ্কার! – প্রতিউত্তর দিয়ে বসে তার মুখপানে চেয়ে রইলাম। আমার চোখে চোখ পড়া মাত্র লাজুক হাঁসি হেসে দৃষ্টি অন্যত্র সরিয়ে ফেলল। চেয়ে দেখলাম এই সপ্তদর্শী কন্যাটির উপর যৌবনের সমস্ত আলো এসে পড়েছে। চোখে-মুখে নারীপ্রকৃতি খেলা করছে। মুখখানি বড়ই সাদা-সিদে ভ্রমর কালো দু' টি চোখ যেন গভীর অরন্যানি। নিবিড় পবিত্র ঐ মুখখানির পানে চাইলেই কবিতার ছন্দ এসে উপস্থিত হয়। বাস্ত বিকই শুভ চিনতে ভুল করেনি। একেবারে পাকা জহুরীর মত খাঁটি হীরা ঠিকই চিনে নিয়েছে। আমি চোরা নেত্রে খুঁটে খুঁটে পরীক্ষা করছি এমনি সময়ে হঠাৎ দরজা খুলে গেল। দেখলাম সম্ভুনাথ কয়েকজনকে সাথে নিয়ে প্রবেশ করছে। বুঝলাম অসমাপ্ত কাজ আজ সমাপ্ত হবে। যা ভাবছিলাম তাই হল। সকলে একত্রে বসে খাতা-পত্র বের করে দেন-মোহর ধার্য করে হাসপাতালেই বিয়ের কাজ সমাপ্ত করল। বিদায় লগ্ন যখন এসে উপস্থিত হল তখন সম্ভুনাথ

কেঁদে ফেলল। শুভর হাত দু'টি শক্ত করে কাঁদ কাঁদ স্বরে বলে উঠল– বাবা, তুমিই ওর প্রাণ রক্ষা করেছ। তোমাকে আর্শীবাদ করি এ সাহস আমার হয় না। তুমি মানুষ নও, দেবতা। তোমার হাতে আমার এ কন্যাটিকে সঁপে দিলাম। যে প্রাণ তুমি রক্ষা করেছ সারাটি জীবন এভাবেই রক্ষা করবে এই আমার বিশ্বাস। এভারে শুভ যা বলল তাতে আমি হতভম্ব হয়ে গেলাম। নতজানু হয়ে পায়ের ধূলো মাথায় নিয়ে প্রণাম করে অত্যান্ত ভক্তিপূর্ণ কণ্ঠে বলে উঠল– আমি মুসলমান, স্ত্রীর সমস্ত অধিকার আদায় করা আমার উপর ফরজ। জীবনের যে কোন মুল্য দিয়ে স্ত্রীকে রক্ষা করা একজন মুসলমানের কর্তব্য। আপনি কোন চিন্তা করবেন না। ইচ্ছে করলে আপনিও আমাদের সাথে থাকতে পারেন।

– তা হয়না বাবা, আমার একটুকরো ভিটে এখনও আছে। সেইটে অবলম্বন করেই বাকী জীবন কাটিয়ে দিতে পারব। তারপর সম্ভুনাথ কন্যার কাছে বিদায় নিতে এল। পিতা-কন্যা উভয়ে অশ্রুপূর্ণ নয়নে একে-অপরের দিকে চাইল। তারপর নারী চরিত্রের অন্যতম প্রধান কাজ পুরুষের কর্মে বিভ্রাট সম্পর্কে সতর্ক দেয়া তাই দিয়ে কন্যা পিতার নিকট হতে বিদায় নিল। বিদায় পর্ব সাঙ্গ হলে নববধুকে নিয়ে আমরা দু'জন যখন গ্রামে পৌঁছলাম তখন রাত্রি বেশ হয়ে গেছে। পল্লীগ্রামের সকলেই এ সময়ে গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন। এতে বেশ সুবিধাই হল। চোরের মত নববধূকে শুভর ঘরে পৌঁছিয়ে দিয়ে গা বাঁচিয়ে চোরের মত ঘরে ফিরতে পারলাম। সকলে জেগে থাকলে বেশ মুশ্‌কিল হত। অগত্যা এ যাত্রা হতে নিস্কৃতি পেলাম পরে যা হবার হোক।

শুভর বিয়ের কথা গোপন রইল না। দু' দিন যেতে না যেতেই গ্রামের সমস্ত আবাল–বৃদ্ধ–বণিতা সকলের মুখে মৌমাছির মত গুঞ্জন উঠে বাতাসে মিশে গ্রাম হতে গ্রামান্তরে ছড়িয়ে যেতে লাগল। সকলের মুখে ঐ একই কথা – অ্যাঁ এ হল কি? মুসলমানের ছেলে হয়ে হিন্দুর মেয়েকে বিয়ে! এ যে ধর্মে সইবে না!

গ্রামের মাথা যারা ছিল তারা সকলে একযোগে মাথা তুলে এ অনাচারের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াল। মস্‌জিদের ইমাম এসে বয়ান করতে লাগলেন – ধর্ম রসাতলে গেল! এইত কিয়ামতের আলামত! দুনিয়া ধ্বংস হবার আর দেরী নেই। ঐ ঈস্রাফিল (আঃ) শিঙ্গায় ফুঁক দিল বুঝি! এক জনের অধর্মের কারণে গোটা গ্রামবাসী জাহান্নামের আগুনে জ্বলতে পারে না। তাই সকলে একযোগে বিচার চাইবার জন্য আমাদের বাড়ীতে এসে উপস্থিত হল। এ দলে মস্‌জিদের হুজুর ও ছিলেন। হুজুর দাদুকে উদ্দেশ্য করে বললেন– এর একটা বিহীত করেন সৈয়দ সাহেব নয়তো আশে-পাশের দশগ্রামে মান ইজ্জত নিয়ে বেঁচে থাকতে পারব বলে মনে হয় না। হুজুরের কথা সমাপ্ত হতে না হতেই চারিদিকে শোরগোল উঠল– হ্যাঁ.....হ্যাঁ ' সৈয়দ সাহেব এর একটা বিহীত করেন। সমবেত সকলের সমর্থন পেয়ে পরের শুক্রবার জুম্মার নামাজ পরে বিচারের সময় ধার্য করে আমার দাদু সভার সমাপ্তি ঘোষনা করলেন। নির্দিষ্ট দিনে আমাদের বাড়ীতে বৈঠক বসল। ইতিমধ্যে শহরে খবর দিয়ে সমস্ত গ্রামের অহংকার সর্বজন মান্য শহর কাঁপানো উকিল আমার বাবাকে ডেকে আনা হয়েছে। বাবার সাথে সাথে গ্রামের আরও

কয়েকজন শিক্ষিত চাকুরীজীবি ও এসে জুটেছেন তাই সকলের ধারণা বিচারটা যুক্তিসিদ্ধই হবে।

বিচার অবশ্য যুক্তিসিদ্ধই হয়। বেশ কয়েকবার তার নমুনা দেখেছি। একটি ঘটনা বেশ স্পষ্ট মনে পড়ে। মেম্বার বাড়ীর ছোট ছেলে আর নিমজুর আক্কাছ আলীর কন্যা শেফালির অনৈতিক সম্পর্কের কথা যখন ফাঁস হয়ে যায় তখন বিচারকালে মস্‌জিদের হুজুর একটি সুঁচ হাতে নিয়ে শেফালিকে সুতো পরানোর কথা বলেন। মেয়েটি যখন সুতো পরাতে যাবে তখন হুজুর হাতটাকে নাড়া দেন ফলশ্রুতিতে মেয়েটি সুতো পরাতে ব্যার্থ হয়। এ নমুনার প্রেক্ষিতে হুজুর সিদ্ধান্ত দিলেন যে সমস্ত দোষ মেয়েটির। এই সুচে সুতো পরানোর মতই যদি ঝাড়া দিত তবে এমন অনৈতিক সম্পর্ক গড়ে উঠত না। সমস্ত দোষ মেয়েটির ঘাড়ে চাপিয়ে পঞ্চাশ ঘা দোররা মেরে গ্রাম ছাড়া করা হল। মেম্বারের ছেলের অপকর্মের হিস্যাস্বরূপ সোনা-রূপার পানি দিয়ে গোসল করিয়ে বড় মিলাদের আয়োজন করা হয়েছিল। হুজুর পেট পুরে খেয়ে এবং পকেট ভরে কড়ি নিয়ে মেম্বারের জয়গান গাইতে গাইতে ঘরে ফিরেছিলেন। এমন যুক্তি সিদ্ধ বিচার আর আছে কি!

গ্রামের আবাল বৃদ্ধ - বনিতা সকলেই এসে জুটেছে। অন্দর মহলে সমবেত নারীদের ও আগ্রহের শেষ নেই। সকলে অধীর আগ্রহে প্রতীক্ষা করে আছে কখন অপরাধী যুগল এসে উপস্থিত হল। অবশ্য ধরে আনতে হয়নি, বীরদর্পেই এসেছে। উৎসুক জনতার দৃষ্টি নিবন্ধিত হচ্ছে শুধুমাত্র অপরাধী যুগল দের দিকেই। দু' একজন যে মুখ টিপে হেঁসে হেঁসে অন্যের গায়ের উপর পড়ছেনা এমনটা নয়।

থাক্ সেসব আর কথা বাড়াব না। অতিরিক্ত কথা বাড়াতে গেলে ঘটনার সত্যতা অনেকটা ম্লান হয়ে যায় আর সত্যের উপর দাঁড়াতে না পারলে লোকে উপহাস করবে তাই কলমট কে টেনে ধরাই শ্রেয়ঃ।

বিচার শুরু হল। উকিলদের জেরা আর বিজ্ঞ হাকিমের বিচারের রায়ে শুভ অভিযুক্ত হল। মহামান্য হাকিম আমার শ্রদ্ধেয় পিতাজান নিতান্ত অবজ্ঞা ভরে বললেন– শেসে কিনা একটা হিন্দুর মেয়েকে বিয়ে করলি, হতভাগা ? দেশে কি মেয়ের অভাব ছিল ? প্রতিউত্তরে অত্যান্ত শান্তস্বরে শুভ বলল – আমার পছন্দ হয়েছে আমি বিয়ে করেছি তা সে হিন্দুই হোক আর মুসলমানই। মুসলমানী মতে যেহেতু বিয়ে হয়েছে এবং চার কলিমা পড়েছে সেহেতু সে ও মুসলমান। – আস্‌তাগফিরুল্লাহ্ – নাউযুবিল্লাহ্ , দেখেছেন – দেখেছেন ভাই সাহেব শয়তানটার দেমাগ। ঐ হতভাগা ধর্ম কি তোর কাছে শিখতে হবে ? তোর নানা ছিল খন্দকার, তুই না।

এক নিঃশ্বাসে মস্‌জিদের হুজুর আমার বাবার দিকে চেয়ে কথাগুলো বলে ফেললেন। শেষ অবধি বিচারের রায় ঘোষিত হল। বিচারের রায় মোতাবেক শুভ এবং তার স্ত্রীকে হাত দু' টো পিছনের দিকে বেঁধে, মাথার চুল ন্যাড়া করে জুতোর মালা পরিয়ে সারা গ্রামময় ঘোরানো হল।

পেছনে পেছনে গ্রাম্য দুষ্ট ছেলের দল নানাবিধ শ্লোগান দিতে দিতে হাঁটছিল আর অপরাধী যুগল লজ্জায়ু ঘৃনায় মাথা নীচু করে সকলের সাথে হেঁটে যেতে লাগল।

অদূরে দাঁড়িয়ে সমস্ত দৃশ্যই দেখলাম এবং শুনলাম কিন্তু প্রতিবাদ করার সাহস ছিল না বলে দ্রুত ঘরে ফিরে দ্বার রুদ্ধ করে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে লাগলাম। বাস্তবিকই শুভকে আমি খুব ভালোবেসেছিলাম। সন্ধ্যা নাগাদ যখন ঘর হতে বের হলাম তখন শুনতে পেরাম সকলে শুভকে একঘরে করেছে। পরের দিন এও শুনতে পেলাম যে যা কিছু নেবার আবশ্যকতা ছিল সবকিছু নিয়ে রাত্রিকালে শুভ এবং তার স্ত্রী সবার অলক্ষ্যে গ্রাম ত্যাগ করেছে।

শুভর ভিটিমাটি অবশ্য শূন্য পড়ে থাকেনি। গ্রামের মাথা এবং জমাকৃত দলিলের গুণে সবকিছুর ভোগ-দখল আমার দাদুই পেয়েছিলেন। মস্‌জিদের হুজুর বোধহয় ভাগ পেয়েছিলেন। না পেলে এমন দহ্‌রম– মহ্‌রম সম্পর্ক টিকে অছে কি করে ? আর এতকিছুর মালিকই বা হলেন কি করে?

শাস্ত্রমতে শুভ হয়তো জাহান্নামে যাবে। যেখানেই যাক্ আজ জীবনের এ মধ্য গগনে এসেও ভাবি ইস্ ! এমনি যদি একজন জাহান্নামের সহযাত্রীকে পেতাম তবে সহস্র বার জাহান্নামের আগুনে পুড়েও শান্তি পেতাম।

খ: ম: আ: গণি, পো:আ: নগর, থানা: বড়ইগ্রাম, জেলা: নাটোর